বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত লোককথার তুলনা ঃ

উত্তরবঙ্গ এক অন্তঃসলিলা সংস্কৃতির সমন্বয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গেই লোককথার সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই কারণেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথার নিবিড় ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। শুধু পারস্পরিক প্রভাবযুক্তই নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথায় ভারতীয় পুরাণ-উপপুরাণ এবং অন্যবিধ লোককথা ঘনিষ্ঠভাবে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে।

আর্য-দ্রাবিড়-নিষাদ-কিরাত বর্গীয় বিভিন্ন ভাষা-উপভাষায় আবদ্ধ, আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক বৈচিত্র্য, ভিন্ন ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক ধারায় বিচিত্র এই বঙ্গের উত্তরবঙ্গ। তথাপি সামগ্রিক বিচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে সমন্বিত। তারজন্য সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোককথার মধ্যে একটি নিবিড় ঐক্য রয়েছে। যদিও ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন জনজাতিসমূহকে বিচ্ছিন্ন মনে করা হয় না, তবুও লোককথার বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জনজাতির লোককথার বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবহেলা করা যায় না। মৌখিক সূত্রে সংগৃহীত এইসব লোককথার মধ্যে সেইসব জনজাতির নানা আচার অনুষ্ঠান বিশ্বাস রীতিনীতি জীবনযাত্রার ইতিকথা ছাড়াও অনেক বৈশিষ্ট্যই সংরক্ষিত।

উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের এক-একটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে। সন্নিহিত বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী নানান সম্প্রদায়ের ভূমিপুত্রদের সামাজিক রীতিনীতির যেমন মিল আছে তেমনি অনেক গড়মিলও আছে। তবুও এই সব সন্নিহিতবাসী সম্প্রদায়ের লোককথাগুলি পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, সৃষ্টিমূলক লোককথা উত্তরবঙ্গের প্রতিটি অঞ্চলেই কম-বেশি পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সৃষ্টিমূলক লোককথার বিভিন্ন বস্তুসৃষ্টির মিথও বহুল প্রচলিত। আর এই মিথের যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি তা কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরাণের কাহিনির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ। আকাশ, পৃথিবী, মাটি, বাতাস ইত্যাদি সৃষ্টিধর্মী মিথকে বিভিন্ন ভারতীয় পুরাণে পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথার মধ্যেও সেই মিথেরই মিল পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে সৃষ্টিমূলক কাহিনিগুলি শুধু লোককথা মাত্রই নয়, বর্তমান জীবনের সঙ্গে যেমন ঘনিষ্ঠ , তেমনি বিশ্বাসযোগ্য রূপেও গৃহীত।

উত্তরদিনাজপুরের মুশমণ্ডিতে প্রাপ্ত একটি লোককথায় বলা হয়েছে 'পূর্বে আকাশখান নিচাত আছিল। মানষির মাথাত নাইকচে। একনা বুড়া নাটি দিয়া গুতিয়া উপরাত ঠেলি দিচে।...' আবার জলপাইগুড়ি জেলার কুমারগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোককথায় আছে—'আকাশখান হোটোংটোংয়া উচাত। একেনা বুড়া হাল বওয়ায়। বুড়াটাক খুব নউদ নাগচে। বুড়াটা ভাবিচে আকাশখান দিয়া বেলাটাক ঢাকি থুইলে নউদ নাগিবে না। গরু সাংরা দড়ি দিয়া দেওয়াখানোক টানিয়া নিচা নামাইতে কালে দিনোতে আন্দার ঘুটঘুটা হইলেক। সেলা বুড়াটা পেন্টি দিয়া এমুন জোরে দেওয়াখানোক ঠেলিল—ফান্নাৎ করি আকাশখান উচাত উঠিল।...' কুচবিহার জেলার বালাভূত এবং দার্জিলিং জেলার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের সন্নিহিত কাওয়াখালিতে প্রায় একই রকম লোককথায় বলা হয়েছে—'একনা বুড়ি বাড়া ভুকায়। গাইন তুলিয়া বল দিয়া ভুকাইতে কালে গাইনটা আকাশোত গুতা নাগে। রাগোতে বুড়িটাবাড়াভুকা গাইন দিয়া আকাশখানোক এমুন জোরে ঠেলিলেক আকাশখান টোংটোংয়া উচাতে উঠিল।...'

স্থানপ্রভেদে শুধু অনুষঙ্গের বদল, মূল বিষয় একই—'আকাশ কেন উপরে'। আসলে সঞ্চরণশীলতার ফলে লোককথার কাহিনির পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে। যাকে বলা হয় 'মাইগ্রেশন তত্ত্ব'। এই মাইগ্রেশন তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক তত্ত্বের নিয়মানুসারে রূপান্তরিত কাহিনির পরিচয় পাওয়া যায়। লোককথার অভ্যন্তরীণ কাঠামো অভিন্ন (constant) থাকলেও বাহ্যিক অবয়ব বদলে (Variable) যায়। বস্তুত প্রাচীনই সব লোককথা উত্তরবঙ্গের লোকসমাজে বিশ্বাসযোগ্য রূপেই প্রতিষ্ঠিত। মনোরঞ্জকধর্মী লোককথার বিস্ময়কর আধিক্য সমগ্র উত্তরবঙ্গেই পরিলক্ষিত হয়। শুধু জোলা বা জুলির সরলতা সম্পর্কে এত বেশি কাহিনি প্রচলিত, যা থেকে বোঝা যায়—পাড়া গাঁয়ের সরল, সাদাসিদে মানুষ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকেই সেইসব লোককথার জন্ম।

পশুপাখি সম্পর্কিত লোককথা উত্তরবঙ্গের প্রতিটি অঞ্চলেই পাওয়া যায়। বাঘ, শেয়াল, কুকুর, ছাগল, মশা, জোঁক, সাপ—প্রভৃতি ইতর প্রাণি এই ধরণের লোককথাব. বিশেষ চরিত্র 'ইটিওলজিক্যাল স্টোরী' বা 'নিদান-কাহিনি' উত্তরবঙ্গে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, সে তুলনায় 'কিউমিউলিটিভ স্টোরী' বা 'শিকল জোড়া কাহিনি'র সংখ্যা খুবই কম।

উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনজাতিদের সঙ্গে আর্যভাষী মানুষ তেমন সন্নিহিত ভাবে বাস করেনি। এবং অন্যান্য প্রাদেশিক জনজাতিদের সঙ্গে প্রাচীন উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক অঞ্চলের জনজাতির নৃতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় ছিল না। তাই উত্তরবঙ্গের জনজাতির লোককথার

মধ্যে স্বভাবতই তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। তাই বলে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের লোককথার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের লোককথা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন—একথা বলা যায় না।ভাষাগত আঞ্চলিকতার মধ্যে কোনক্রমেই লোককথার কথা সীমাবদ্ধ নয়। মুখে মুখে প্রচারিত বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে, কখনও অল্প কিছু পরিবর্তিত হয়ে আঞ্চলিক সমাজ সংহতির বৈচিত্র্য রক্ষা করে সার্বিক ভাবগত ঐক্য অক্ষুন্ন রাখে। সেজন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত লোককথাকে যে পরিমাণে উত্তরবঙ্গের লোককথা নামে অভিহিত করা যায়, সেই পরিমাণেই তাকে 'সমগ্র বঙ্গে'র কিংবা ভারতবর্ষেরই লোককথা বলা যেতে পারে। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত স্থানীয় কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে কিছু কিছু লোককথায় স্থানীয় বৈচিত্র্য থাকে। সারা উত্তরবঙ্গেই প্রচলিত রয়েছে এমন অনেক কিংবদন্তী, যার সঙ্গে ইতিহাসের ক্ষীণ যোগসূত্র থাকলেও, লোকবিশ্বাসের রাজ্যেই তার অবস্থান। একসময় 'রাজা গোপাল' ছিলেন, রাজ্য শাসন করেছিলেন— ইতিহাসের পাতায় তার সাক্ষ্য অনেক। রাজা গোপালের কথা মোটেই ইতিহাস বিচ্ছিন্ন নয়। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি রাজা গোপাল গৌড়বঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। বর্তমানে সমগ্র উত্তরবঙ্গেই রাজা গোপাল সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তীমূলক লোককথা প্রচলিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে পরিশিষ্টে 'রাজা গোপাল' লোককথাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে ।

উত্তরবঙ্গের তথা বিভিন্ন প্রান্তের লোককথার বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রবহমান লোককথা কখনও নতুন করে বলা, কোথাও বিচ্ছিন্ন অংশের সংযোজন। এই অবস্থায় বিভিন্ন স্থানের লোককথার টাইপ ও মোটিভ মূলত একই। তবে লোককথার ক্ষেত্রটি যেহেতু বিশাল এবং বৈচিত্র্যময়, তাই সামগ্রিক বিচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণ, সহজ সাধ্য না হলেও অন্তত একটি মৌলিক সূত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হতে পারে, তা হল উত্তরবঙ্গের মানুষ ও ইতিহাস এক প্রাচীন ধারাকে আজও বহন করে চলেছে। নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, রীতি-নীতিগত, ধর্মীয় ভাবনাগত ভাবে নানা সমারোহের বৈচিত্র্য উত্তরবঙ্গের লোককথায় প্রকাশিত। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোককথায় এক অসাধারণ ঐক্যেরই ছবি আমরা লক্ষ্য করতে পাই।

লৈখিক রূপের সঙ্গে মৌখিক রূপের তুলনা ঃ

আমরা আলোচনায় দেখেছি যে, লোককথার মোটিফ ও টাইপগুলি সুপ্রাচীন কাল থেকে এই উপমহাদেশের মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। মৌখিক ঐতিহ্য থেকেই লোককথার মূল উপাদানগুলো কখনো কখনো লিখিত সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। স্বীকার করতে হবে যে, এই ভারতীয় উপমহাদেশের

প্রাচীন লিখিত সাহিত্যের বিরাটতম একটা অংশ মুখে মুখে প্রচলিত অর্থাৎ মৌখিক সাহিত্যের উপাদানে সমৃদ্ধ. এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে. সেকালের লোকসাহিত্য লিখিত সাহিত্যের কাছে যতটা ঋণী. লিখিত সাহিত্য মৌখিক সাহিত্যের কাছে তার চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে ঋণী। উদাহরণ হিসেবে ভারতীয় তথা বাংলার লোককাহিনিতে পশু ও পাখিকে প্রায়ই মানুষের সমপর্যায়ে এবং সমমর্যাদায় আসন দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্বখ্যাত লোককাহিনি 'জাতক (৩০০খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পঞ্চতন্ত্র (১০০- ৩০০ খ্রি.) বেতাল পঞ্চবিংশতি (৫০০-৮০০ খ্রি.) বৃহৎকথা (১১০০খ্রি.) এবং কথা সরিৎসাগর (১০০০-১২০০খ্রি.) (গ্রন্থসমূহের সময় সম্পর্কে সমালোচক গণের মতভেদ রয়েছে) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে এধরণের কাহিনির অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় লিখিত সাহিত্যেও এই নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালের লিখিত সাহিত্যগুলি মৌখিক সাহিত্যের এই বিশাল প্রভাবের পরিমণ্ডল থেকে দূরে থাকতে পারেনি।

বস্তুতঃ সুদূর অতীতকাল থেকে লিখিত সাহিত্য লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে প্রেরণা গ্রহণ করে আসছে এবং এই গ্রহণের ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে লিখিত সাহিত্য থেকেও লোকসাহিত্য অতীতে যেমন প্রচুর উপাদান গ্রহণ করেছে বর্তমানেও তার অবসান ঘটেনি। একথাও সত্যি যে, কালের পরিববর্তনে লোকসাহিত্য মৌখিক ঐতিহ্য (Oral tradition) ছাড়াও লিখিতভাবেও সৃজিত হয়। লোককথা প্রাচীনকালের একথা যেমন সত্য, লোককথা আধুনিক কালের একথাও সমভাবে সত্য; সে যেমন মুখে মুখে রচিত, প্রচলিত তেমনি লিখিত ভাবেও রচিত ও প্রচলিত, সে যেমন ঐতিহ্যের সৃষ্টি তেমনি ঐতিহ্যের স্রষ্টাও বটে।

লোককথার অধিকাংশ উপাদানের স্রষ্টা ব্যক্তি, অর্থাৎ কোন একজন, তবে সেই একজনের সম্পদ সমগ্র জাতির সম্পদে পরিণত হয়। সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতা, নান্দনিক চেতনা ও রসানুভূতি লোককথায় ধরা পড়ে। লোককথায় তীক্ষ্নবুদ্ধিবৃত্তির ছাপও প্রচুর পরিমাণেবর্তমান, তবে তা অনেকট মানুষের সহজাতপ্রবৃত্তি থেকে উৎসারিত—সেখানে জাতির বা সেই সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিই যেন প্রশ্রয় পায়, সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার প্রাখর্যই লোককথায় বাণীরূপ লাভ করে। লোককথায় হৃদয়বৃত্তির প্রাধান্যই মুখ্য, স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীলতা তার প্রধান উৎস, দীর্ঘকালের অর্জিত জ্ঞান তার আশ্রয়, লোকরঞ্জনের ক্ষমতা তার সম্বল। আর এই সমস্ত বিশেষণের জন্যই মৌখিক লোককথা লৈখিক লোককথা থেকে পৃথক।

খুব চেনা জানা, দেখা শোনা মানুষের জীবনেরই কথা— লোককথা। লোককথার কাহিনিতে যতই অতিলৌকিকতা থাকুক না কেন, লোককথার কাহিনি সাধারণ মানুষেরই জীবনেরই কথা।

সাধারণ মানুষের এই জীবন—ইতিকথাগুলি কথকের বলার বা কথনের গুণে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। ফলে লোককথার কাহিনি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। বস্তুত কাহিনির মধ্য দিয়ে চিরায়ত সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার স্বভাবধর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ভাবতে শিখেছেন মৌখিক ভাবে কথকদের মাধ্যমে। তাছাড়া আমরা জানি , বিপুল কথাসাহিত্যের সম্ভার মানুষের কাছে এসেছে মৌখিকভাবে কথকদের কল্যাণে। বঞ্চিত মানুষের অবমাননার প্রতিশোধ স্পৃহা এবং ইচ্ছাপূরণ জনিত আনন্দের প্রকাশ অংশের বিবরণে কথকের আত্মতৃপ্তির নির্দেশ পাই। অনেক সময় দেখা যায় লোককথার অপরিবর্তনীয় (Constant) অন্তর কাঠামোর উপর পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতির অনুসারে অনেক উপকরণ যুক্ত হয়, আর এই উপকরণগুলি বাচকগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার রসে অভিসিঞ্চিত হয়। শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য (Concentration) চেনাজানা প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ, উত্থাপন করা হয়। এই অনুষঙ্গগুলি শ্রোতার মানস চোখে সংবেদনশীল (Phychological Visual Sensation) দৃশ্য উত্থাপন করে। এইভাবে লোককথার সঙ্গে লোকমানসিকতার নিবিড় সংযোগ (Communication) নির্মিত হয়।

রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মীয় ভাবাদর্শের উত্থান পতনের পরিচয় পাওয়া যায় লোককথায়। সেদিক থেকে লোককথা আমাদের জাতীয় জীবনের মূল্যবান দলিল। এই বিশেষ সম্পদগুলি লোককথার কথক লোকমানসে তুলে ধরেন। কথকের উপস্থাপনার গুণে সাধারণ মানুষ পরোক্ষে অনেক গভীর জ্ঞান অর্জন করে থাকে। কথকেরা কোন কোন কাহিনির বাইরের কাঠামোতে নিজের পছন্দমত উদাহরণ, উপমা ও ভাষা ব্যবহার করেন। ঘটনা ও পরিবেশ পটভূমির প্রেক্ষিতে সেই সব শব্দ, উদাহরণ, উপমা ও ভাষা শ্রোতাদের মনে বিশেষ ছাপ ফেলে। ঘটনার ঘনঘটা ও আঘাত-সংঘাতময় পরিস্থিতির বিবরণে যে নাট্যরস সৃষ্টি হয়, লিখিত লোককথায় তা পাওয়া যায় না। আসলে কথকদের সেই আকর্ষণীয় রোমাঞ্চকর গল্পবলার স্রোতধারা লিখিত রূপে ক্ষীণ হয়ে আসে। ছাপানো অক্ষরে লোককথার রসাস্বাদন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতই।